কারবালায় কী ঘটেছিল?

রচনায়ঃ
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল- মাদানী

(কারবালার ঘটনা সম্পর্কে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-
যা অনেক ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিবে ইনশা- আল্লাহ)

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

কারবালায় কী ঘটেছিল?

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল- মাদানী

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১২

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরুর

মূল্য: ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স

৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর।

সৌভাগ্যবান শহীদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দৌহিত্র সায়্যেদ হোসাইন বিন আলী (রাঃ)এর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়াকে কেন্দ্র করে নেক ঘটনাই প্রসিদ্ধ রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক মুসলিমের মধ্যে এ বিষয়ে বিরাট বিভ্রান্তি রয়েছে। দেশের রাষ্ট্র প্রতি, প্রধান মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতাগণ, ইসলামী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এ দিন উপলক্ষে জাতির সামনে প্রতিবছর বিশেষ বাণী তুলে ধরেন। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এ দিন আমাদের দেশে সরকারী ছুটি থাকে। তাদের সকলের কথা ঘুরে ফিরে একটাই। স্বৈরাচারী, জালেম, নিষ্ঠুর ও নরপশু ইয়াজিদের হাতে এ দিনে রাসূলের দৌহিত্র ইমাম হুসাইন নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এ জন্য এটি একটি পবিত্র দিন। বিশেষ একটি সম্প্রদায় এ দিন উপলক্ষে তাজিয়া মিছিলসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বিষাদসিন্ধু নামক একটি উপন্যাস পড়ে বা এর কিছু বানোয়াট ও কাল্পনিক কাহিনী শুনে সুন্নি মুসলিমগণও এ বিষয়ে ধুম্রজালে আটকা পড়েছেন।

জাতির ভুল- ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য আজ আমি এ বিষয়ে সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য প্রকাশ করার কাজে অগ্রসর হতে বাধ্য হলাম। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি ভূমিকা পেশ করতে চাই। মন দিয়ে ভূমিকাটি পড়লে মূল বিষয় বুঝতে সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, আমার লেখাটি পড়ে এ বিষয়ে অনেকের আকীদাহ সংশোধন হবে। আর যারা বিষয়টি নিয়ে সংশয়ে আছেন, তাদেরও সংশয় কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দৌহিত্র সায়্যেদ হোসাইন বিন আলী (রাঃ)এর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়ার ঘটনায় ব্যথিত হওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির নেতা ও ইমামদের অন্যতম। রাসূল (ﷺ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)এর পুত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ) একজন বিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন একধারে এবাদত গুজার, দানবীর এবং অত্যন্ত সাহসী বীর। হাসান ও হুসাইনের ফজিলতে রাসূল (ﷺ) থেকে একাধিক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্যতম আলামত এবং নবী পরিবারের কোন সদস্যকে ঘৃণা করা ও গালি দেয়া মুনাফেকির সুস্পষ্ট লক্ষণ। যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত কেবল তারাই ইমাম হুসাইন (রাঃ) বা নবী পরিবারের পবিত্র সদস্যদেরকে ঘৃণা করতে পারে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ অনুযায়ী ইমাম হুসাইন বা অন্য কারও মৃত্যুতে মাতম করা জায়েজ নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল মুসলিম জাতির বিরাট একটি গোষ্ঠী ইমাম হুসাইন (রাঃ)এর মৃত্যুতে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে থাকে। যারা হুসাইনের মৃত্যু ও কারবালার ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, তাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করা খুবই যুক্তিসংগত মনে করছি। যে সমস্ত সুন্নী মুসলিম সঠিক তথ্য না জানার কারণে এ ব্যাপারে সন্দিহান ও বিভ্রান্তিতে আছেন তাদের কাছেও আমার একই প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই প্রকৃত ঘটনা বুঝা খুব সহজ হবে ইনশা- আল্লাহ।

প্রথম প্রশ্ন: হুসাইনের পিতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) হুসাইনের চেয়ে অধিক উত্তম ছিলেন। তিনি ৪০ হিজরী সালে রামাযান মাসের ১৭ তারিখ জুমার দিন ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আব্দুর রাহমান বিন মুলজিম খারেজীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। তারা হুসাইনের মৃত্যু উদযাপনের ন্যায় তাঁর পিতার মৃত্যু উপলক্ষে মাতম করে না কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ অনুযায়ী উসমান বিন আফফান (রাঃ) ছিলেন আলী ও হুসাইন (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক উত্তম। তিনি ৩৬ হিজরী সালে যুল হজ্জ মাসের আইয়্যামে তাশরীকে স্বীয় বাস ভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় মাজলুমভাবে নিহত হন। ন্যায় পরায়ণ এই খলীফাকে পশুর ন্যায় জবাই করা হয়েছে। তারা তাঁর হত্যা দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করে না কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন: এমনিভাবে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উসমান এবং আলী (রাঃ) থেকেও উত্তম ছিলেন। তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে জামআতের ইমামতি করছিলেন। এমন অবস্থায় আবু লুলু নামক একজন অগ্নি পূজক তাঁকে দুই দিকে ধারালো একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে। সাথে সাথে তিনি ধরাশায়ী হয়ে যান এবং শহীদ হন। লোকেরা সেই দিনে মাতম করে না কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন: ইসলামের প্রথম খলীফা এবং রাসূলের বিপদের দিনের সাথী আবু বকর (রাঃ)-এর মৃত্যু কি মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক নয়? তিনি কি রাসূলের পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন না? তার মৃত্যু দিবসে তারা তাজিয়া করে না কেন?

পঞ্চম প্রশ্ন: সর্বোপরি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত বনী আদমের সরদার। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অন্যান্য নবীদের ন্যায় স্বীয় সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। সাহাবীদের জন্য রাসূল (ﷺ) - এর মৃত্যুর চেয়ে অধিক বড় আর কোন মুসীবত ছিল না। তিনি ছিলেন তাদের কাছে স্বীয় জীবন, সম্পদ ও পরিবার- পরিজনের চেয়েও অধিক প্রিয়। তারপরও তাদের কেউ রাসূলের মৃত্যুতে মাতম করেন নি। হুসাইনের প্রেমে মাতালগণকে রাসূলের মৃত্যু দিবসকে উৎসব ও শোক প্রকাশের দিন হিসেবে নির্ধারণ করতে দেখা যায় না কেন?

ষষ্ঠ প্রশ্ন: হুসাইন (রাঃ)- এর চেয়ে বহুগুণ বেশী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মৃত্যু দিবসকে বাদ দিয়ে ইমাম হুসাইনের মৃত্যুকে বেছে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি শুরু করা হল কেন?

সপ্তম প্রশ্নঃ সর্বোপরি সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে নবী (ﷺ)-এর অন্য নাতি ফাতেমা (রাঃ)- এর সন্তান এবং হুসাইনের ছোট ভাই হাসানের মৃত্যুতে তারা মাতম করে না কেন? তিনি কি হুসাইনের চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার এই লেখার শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখাটি পাঠ করলে উত্তরটি সহজেই বোধগম্য হওয়া যাবে ইনশা- আল্লাহ সর্বোপরি ইসলামে কারও জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করার এবং কারও মৃত্যুতে মাতম করা, উচ্চ স্বরে বিলাপ করা এবং অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান করার কোন ভিত্তি নেই। শুধু তাই নয় এটি একটি জঘন্য বিদআত, যা পরিত্যাগ করা জরুরী। নবী (ﷺ) বা তাঁর কোন সাহাবী কারও জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করেন নি।

কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণ করার প্রকৃত ঘটনা

৬০ হিজরিতে ইরাক বাসীদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হুসাইন (রাঃ) ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া হাতে বায়আত করেন নি। তারা তাঁর নিকট চিঠি- পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে ইরাক বাসীরা তাঁর হাতে খেলাফতের বায়আত করতে আগ্রহী। ইয়াজিদকে তারা সমর্থন করেন না বলেও সাফ জানিয়ে দিল। তারা আরও বলল যে, ইরাক বাসীরা ইয়াজিদের পিতা মুয়াবিয়া (রাঃ)- এর প্রতিও মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল। এভাবে পাঁচ শতাধিক চিঠি হুসাইন (রাঃ)এর কাছে এসে জমা হল।

প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য হুসাইন (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে পাঠালেন। মুসলিম কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখলেন, আসলেই লোকেরা হুসাইনকে চাচ্ছে। লোকেরা মুসলিমের হাতেই হুসাইনের পক্ষে বয়াত নেওয়া শুরু করল। হানী বিন উরওয়ার ঘরে বায়আত সম্পন্ন হল।

সিরিয়াতে ইয়াজিদের নিকট এই খবর পৌঁছা মাত্র বসরার গভর্ণর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাঠালেন। ইয়াজিদ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন কুফা বাসীকে তার বিরুদ্ধে হুসাইনের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। সে হুসাইনকে হত্যা করার আদেশ দেন নি।

উবাইদুল্লাহ কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বিষয়টি তদন্ত করতে লাগলেন এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, হানী বিন উরওয়ার ঘরে হুসাইনের পক্ষে বায়আত নেওয়া হচ্ছে।

অতঃপর মুসলিম বিন আকীল চার হাজার সমর্থক নিয়ে অগ্রসর হয়ে দ্বিপ্রহরের সময় উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও

করলেন। এ সময় উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি ইয়াজিদের সেনা বাহিনীর ভয় দেখালেন। তিনি এমন ভীতি প্রদর্শন করলেন যে, লোকেরা ইয়াজিদের ধরপাকড় এবং শাস্তির ভয়ে আস্তে আস্তে পলায়ন করতে শুরু করল। ইয়াজিদের ভয়ে কুফা বাসীদের পলায়ন ও বিশ্বাস ঘাতকতার লোমহর্ষক ঘটনা জানতে চাইলে পাঠকদের প্রতি ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) কর্তৃক রচিত মিনহাজুস সুন্নাহ বইটি পড়ার অনুরোধ রইল। যাই হোক কুফা বাসীদের চার হাজার লোক পালাতে পালাতে এক পর্যায়ে মুসলিম বিন আকীলের সাথে মাত্র তিন জন লোক অবশিষ্ট রইল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুসলিম বিন আকীল দেখলেন, হুসাইন প্রেমিক আল্লাহর একজন বান্দাও তার সাথে অবশিষ্ট নেই। এবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। মুসলিম বিন আকীল উবাইদুল্লাহএর নিকট আবেদন করলেন, তাকে যেন হুসাইনের নিকট একটি চিঠি পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়। এতে উবাইদুল্লাহ রাজী হলেন। চিঠির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল এ রকম:

"হুসাইন! পরিবার- পরিজন নিয়ে ফেরত যাও। কুফা বাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। কেননা তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। আমার সাথেও তারা সত্য বলেনি। আমার দেয়া এই তথ্য মিথ্যা নয়।" অতঃপর যুল হজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফা দিবসে উবাইদুল্লাহ মুসলিমকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলিম ইতিপূর্বে কুফা বাসীদের ওয়াদার উপর ভিত্তি করে হুসাইনকে আগমনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠির উপর ভিত্তি করে যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে হুসাইন (ﷺ) মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ বিন আমর এবং তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে উমার (ﷺ) হুসাইনকে লক্ষ্য করে বলেন: হুসাইন! আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাবো। জিবরীল (ﷺ) আগমন করে নবী (ﷺ)কে দুনিয়া এবং আখিরাত- এ দুটি থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়া বাদ দিয়ে আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন। আর তুমি তাঁর অংশ। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ কখনই দুনিয়ার সম্পদ লাভে সক্ষম হবেন না। তোমাদের ভালর জন্যই আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার ভোগ- বিলাস থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। হুসাইন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যাত্রা বিরতি করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর ইবনে উমর (ﷺ) হুসাইনের সাথে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন এবং ক্রন্দন করলেন।

সুফীয়ান ছাওরী ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (ﷺ) হুসাইনকে বলেছেন: মানুষের দোষারোপের ভয় না থাকলে আমি তোমার ঘাড়ে ধরে বিরত রাখতাম।

বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (ﷺ) হুসাইনকে বলেছেন: হোসাইন! কোথায় যাও? এমন লোকদের কাছে, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং তোমার ভাইকে আঘাত করেছে?

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (ﷺ) বলেছেন: হুসাইন তাঁর জন্য নির্ধারিত ফয়সালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর বের হওয়ার সময় আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে কখনই তাকে যেতে দিতাম না। তবে বল প্রয়োগ করে আমাকে পরাজিত করলে সে কথা ভিন্ন। (ইয়াহ্‌-ইয়া ইবনে মাঈন সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

যাত্রা পথে হুসাইনের কাছে মুসলিমের সেই চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠির বিষয় অবগত হয়ে তিনি কুফার পথ পরিহার করে ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার জন্য সিরিয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে ইয়াজিদের সৈন্যরা আমর বিন সাদ, সীমার বিন যুল জাওশান

এবং হুসাইন বিন তামীমের নেতৃত্বে কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের গতিরোধ করল। হুসাইন সেখানে অবতরণ করে আল্লাহর দোহাই দিয়ে এবং ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন।

হুসাইন বিন আলী (রাঃ) এবং রাসূলের দৌহিত্রকে ইয়াজিদের দরবারে যেতে দেয়া হোক। তিনি সেখানে গিয়ে ইয়াজিদের হাতে বয়াত গ্রহণ করবেন। কেননা তিনি জানতেন যে, ইয়াজিদ তাঁকে হত্যা করতে চান না।

অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেয়া হোক।

অথবা তাঁকে কোন ইসলামী অঞ্চলের সীমান্তের দিকে চলে যেতে দেয়া হোক। সেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করবেন এবং রাজ্যের সীমানা পাহারা দেয়ার কাজে আত্ম নিয়োগ করবেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

ইয়াজিদের সৈন্যরা কোন প্রস্তাবই মানতে রাজী হল না। তারা বলল: উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ যেই ফয়সালা দিবেন আমরা তা ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব মানতে রাজী নই। এই কথা শুনে উবাইদুল্লাহএর এক সেনাপতি (হুর বিন ইয়াজিদ) বললেন: এরা তোমাদের কাছে যেই প্রস্তাব পেশ করছে তা কি তোমরা মানবে না? আল্লাহর কসম! তুর্কী এবং দায়লামের লোকেরাও যদি তোমাদের কাছে এই প্রার্থনাটি করত, তাহলে তা ফেরত দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হত না। এরপরও তারা উবাইদুল্লাহএর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করল। সেই সেনাপতি ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন এবং হুসাইন ও তাঁর সাথীদের দিকে গমন করলেন। হুসাইনের সাথীগণ ভাবলেন: তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছেন। তিনি কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে উবাইদুল্লাহএর সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের দুইজনকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনিও নিহত হলেন।

(ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে হুসাইনের সাথী ও ইয়াজিদের সৈনিকদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। হুসাইনের সামনেই তাঁর সকল সাথী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। অবশেষে তিনি ছাড়া আর কেউ জীবিত রইলেন না। তিনি ছিলেন সিংহের মত সাহসী বীর। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলায় তাঁর পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। কুফা বাসী প্রতিটি সৈনিকের কামনা ছিল সে ছাড়া অন্য কেউ হুসাইনকে হত্যা করে ফেলুক। যাতে তার হাত রাসূলের দৌহিত্রের রক্তে রঙ্গিন না হয়। পরিশেষে নিকৃষ্ট এক ব্যক্তি হুসাইনকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়। তার নাম ছিল সীমার বিন যুল জাওশান। সে বর্শা দিয়ে হুসাইনের শরীরে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলল। অতঃপর ইয়াজিদ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে ৬১ হিজরীর মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে আশুরার পবিত্র দিনে ৫৭ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

বলা হয় এই সীমারই হুসাইনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কেউ কেই বলেন: সিনান বিন আনাস আন্ নাখঈ নামক এক ব্যক্তি তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ফুরাত নদীর পানি পান করা থেকে বিরত রাখার কিচ্ছা

বেশ কিছু গ্রন্থ তাকে ফুরাত নদীর পানি পান করা থেকে বিরত রাখার ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। আরও বলা হয় যে, তিনি পানির পিপাসায় মারা যান। এ ছাড়াও আরও অনেক কথা বলে মানুষকে আবেগময় করে যুগে যুগে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং মূল সত্যটি উপলব্ধি করতে তাদেরকে বিরত রাখার হীন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এ সব কাল্পনিক গল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ঘটনার যতটুকু সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আমাদের জন্য ততটুকুই যথেষ্ট। কোন সন্দেহ নেই যে, কারবালার প্রান্তরে হুসাইন নিহত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বেদনা দায়ক। ধ্বংস হোক হুসাইনের হত্যাকারীগণ! ধ্বংস

হোক হুসাইনের হত্যায় সহযোগীরা! আল্লাহর ক্রোধ তাদেরকে ঘেরাও করুক। আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলের দৌহিত্র শহীদ হুসাইন এবং তাঁর সাথীদেরকে স্বীয় রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা আচ্ছাদিত করুক।

কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন

আলী (রাঃ)এর সন্তানদের মধ্যে থেকে আবু বকর, মুহাম্মাদ, উসমান, জাফর এবং আব্বাস।

হোসাইনের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী আঁকবার এবং আব্দুল্লাহ।

হাসানের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, আব্দুল্লাহ এবং কাসেম।

আকীলের সন্তানদের মধ্যে হতে জাফর, আব্দুর রাহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল।

আব্দুল্লাহ বিন জাফরের সন্তানদের মধ্যে হতে আউন এবং আব্দুল্লাহ। ইতি পূর্বে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নির্দেশে মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন

কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ধারণা ঠিক নয়

হুসাইন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে আকাশ থেকে রক্তের বৃষ্টি হওয়া, সেখানের কোন পাথর উঠালেই তার নীচ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং কোন উট জবাই করলেই তা রক্তে পরিণত হয়ে যাওয়ার ধারণা মিথ্যা ও বানোয়াট। মুসলমানদের আবেক ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ সমস্ত বানোয়াট ঘটনা বলা হয়ে থাকে। এগুলোর কোন সহীহ সনদ নেই।

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন: হুসাইনের মৃত্যুর ঘটনায় লোকেরা উল্লেখ করে থাকে যে, সে দিন কোন পাথর উল্টালেই রক্ত বের হত, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, আকাশের দিগন্ত লাল হয়ে গিয়েছিল এবং আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হয়েছিল। এসব কথা সন্দেহ মূলক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এগুলো বিশেষ একটি গোষ্ঠীর বানোয়াট ও মিথ্যা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বিষয়টিকে বড় করার জন্য এগুলো রচনা করেছে।

কোন সন্দেহ নেই যে, কারবালার ময়দানে সপরিবারে হুসাইনের শাহাদাত বরণ একটি বিরাট ঘটনা। কিন্তু তারা এটিকে কেন্দ্র করে যে মিথ্যা রচনা করেছে, তার কোনটিই সংঘটিত হয় নি।

ইসলামের ইতিহাসে হুসাইনের মৃত্যুর চেয়ে অধিক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে সমস্ত ঘটনায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোনটিই সংঘটিত হয় নি। হুসাইনের পিতা আলী (রাঃ) আব্দুর রাহমান মুলজিম খারেজীর হাতে নির্মম ভাবে নিহত হন। সকল আলেমের ঐকমতে হুসাইনের চেয়ে আলী (রাঃ) অধিক শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ছিলেন। তার শাহাদাতের দিন কোন পাথর উল্টালেই রক্ত বের হয় নি, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয় নি, আকাশের দিগন্ত লাল হয়ে যায় নি এবং আকাশ থেকে পাথরও বর্ষিত হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই।

উসমান বিন আফফান (রাঃ)এর বাড়ি ঘেরাও করে বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করে। তিনি মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে এসবের কোনটিই সংঘটিত হয় নি। উসমান (রাঃ)এর পূর্বে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ফজরের নামাযে দাঁড়ানোর সময় নির্মমভাবে নিহত হন। এই ঘটনায় মুসলিমগণ এমন মুসীবতে পড়েছিলেন, যা ইতিপূর্বে কখনও পড়েন নি। তাতে উপরোক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায় নি।

আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা সমগ্র নবী- রাসূলের সরদার রাহমাতুল লিল আলামীন মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এমন কিছু সংঘটিত হয় নি। যেদিন রাসূল (ﷺ)-এর শিশু পুত্র ইবরাহীম মৃত্যু বরণ করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। লোকেরা বলতে লাগল: ইবরাহীমের মৃত্যুতে আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূল (ﷺ) সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করলেন এবং খুতবা প্রদান করলেন। খুতবায় তিনি বর্ণনা করলেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র কারও মৃত্যু বা জন্ম গ্রহণের কারণে আলোহীন হয় না। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন। তিনি এগুলোর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন।

হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)- এর বের হওয়া ন্যায় সংগত ছিল কি?

বিজ্ঞ সাহাবীদের মতে কুফার উদ্দেশ্যে হুসাইনের বের হওয়াতে কল্যাণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নি। এ জন্যই অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি বিরত হন নি। কুফায় যাওয়ার কারণেই ঐ সমস্ত জালেম ও স্বৈরাচারেরা রাসূলের দৌহিত্রকে শহীদ করতে সক্ষম হয়েছিল। তার বের হওয়া এবং নিহত হওয়াতে যে পরিমাণ ফিতনা ও ফসাদ সৃষ্টি হয়েছিল, মদিনায় অবস্থান করলে তা হওয়ার ছিল না। কিন্তু মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা ও তকদীরের লিখন বাস্তবে পরিণত হওয়া ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। হুসাইনের হত্যায় বিরাট বড় অন্যায় সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তা নবীদের হত্যার চেয়ে অধিক ভয়াবহ ছিল না। আল্লাহর নবী ইয়াহ-ইয়া (আঃ)কে পাপিষ্ঠরা হত্যা করেছে। জাকারিয়া (আঃ)কেও তাঁর জাতির লোকেরা নির্মমভাবে শহীদ করেছে। এমনি আরও অনেক নবীকে বনী ইসরাইলরা কতল করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"তুমি তাদের বলে দাও, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রসূল নিদর্শনসমূহ এবং তোমরা যা আবদার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।" (সূরা আল-ইমরান: ১৮৩) এমনভাবে উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)- কেও হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর হত্যা কাণ্ড নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার কোন যুক্তি নেই।

কারবালার ঘটনাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব?

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে কোন মুসলিমের মৃত্যুতে বিলাপ ও উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটি নিঃসন্দেহে একটি পাপের কাজ। ইমাম হুসাইন (রাঃ)- এর মৃত্যু অন্যান্য মুসলিমদের মৃত্যু থেকে আলাদা কোন ঘটনা নয়। সুতরাং যে মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে

তার জন্য হুসাইনের নিহত হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে বিলাপ করা, শরীর জখম করা, গাল, মাথা ও বুক থাবড়ানো বা এ রকম অন্য কিছু করা জায়েজ নেই।

নবী (সাঃ) বলেন:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَ شَقَّ الْجُيُوْبَ)

"যে ব্যক্তি মুসীবতে পড়ে নিজ গালে চপেটাঘাত করল এবং শরীরের কাপড় ছিঁড়ল, সে আমাদের দলের নয়।" (বুখারী)

তিনি আরও বলেন: "মুসীবতে পড়ে বিলাপকারী, মাথা মুন্ডনকারী এবং কাপড় ও শরীর কর্তনকারীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

রাসূল (সাঃ) আরও বলেন:

(إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ فَإِنَّهَا تُلْبَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِرْعًا مِنْ جَرَبٍ وَ سِرْبَالًا مِنْ قَطِرَانٍ)

মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন খাঁজলীযুক্ত (লোহার কাঁটাযুক্ত) কোর্তা পড়ানো হবে এবং আলকাতরার প্রলেপ লাগানো পায়জামা পড়ানো হবে। (মুসলিম)

তিনি আরও বলেন:

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: اَلْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةِ.

"আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। তারা তা ছাড়তে পারবে না। (১) বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, (২) মানুষের বংশের নাম তুলে দুর্নাম করা, (৩) তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং (৪) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা। তিনি আরও বলেন: মানুষের মাঝে দুটি জিনিষ রয়েছে, যা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের বংশের বদনাম করা এবং মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা।" (মুসলিম)

তিনি আরও বলেন:

النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ

"মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আলকাতরার প্রলেপ লাগানো জামা পড়াবেন এবং অগ্নি শিখা দ্বারা নির্মিত কোর্তা পরাবেন।" (ইবনে মাজাহ)

একজন বিবেকবান মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে সে এ ধরণের মুসীবতের সময় আল্লাহর নির্দেশিত কথা বলবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: {الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ ۙ قَالُوٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ}

"যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" (সূরা বাকারাঃ ২/১৫৬)

হুসাইনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী বিন হুসাইন, মুহাম্মাদ এবং জাফর জীবিত ছিলেন। তাদের কেউ হুসাইনের মৃত্যুতে মাতম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারা ছিলেন আমাদের হেদায়েতের ইমাম ও আদর্শ।

বিলাপ করা, গাল ও বুকে চপেটাঘাত করা বা এ জাতীয় অন্য কোন কাজ কখনই এবাদত হতে পারে না। আশুরার দিনে ক্রন্দনের ফজীলতে যে সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হয় তার কোনটিই বিশুদ্ধ নয়। বিলাপ করা জাহেলী জামানার আচরণ বলে রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার ক্ষেত্রে শিয়া মাজহাবের মতামত

বিলাপ থেকে বিরত থাকার আদেশ শুধু সুন্নি মুসলিম বা বনী উমাইয়াদের জন্য নয় কিংবা এটি কেবল তাদেরই আচরণ নয় যে, শিয়ারা তা গ্রহণ করতে পারেন না; বরং আহলে বাইতের কথাও তাই। আহলে সুন্নত এবং শিয়া উভয় শ্রেণীর নিকটই মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

শিয়া আলেম ইবনে বাবুওয়াই আল- কুমী বলেন: রাসূল (ﷺ) বলেছেন: বিলাপ করা জাহেলী জামানার কাজ।

(দেখুন শিয়াদের কিতাব: من لا يحضره الفقيه)

মাজলেসী থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, النياحة عمل الجاهلية অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চ স্বরে রোদন করা জাহেলিয়াতের কাজ।

(দেখুন: বিহারুল আনওয়ার ১০/৮২)

রাসূল (ﷺ) থেকে এ ধরণের নিষেধাজ্ঞার কারণেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের লোকেরা যে কোন মুসীবতের সময় মাতম ও বিলাপ করা থেকে বিরত থাকেন।

আশুরার দিনে আমাদের করণীয় কী

সুন্নি মুসলিমগণ এই দিনে রোজা রাখেন। কারণ এটি এমন একটি দিন যাতে আল্লাহ তায়ালা মুসা ও তাঁর জাতির লোকদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামআতের লোকেরা মনে করেন, খালেস দিলে রোজা অবস্থায় হুসাইনের জন্য দুয়া করা জাহেলী জামানার আচরণের মত মাতম ও বিলাপ করার চেয়ে অনেক উত্তম। এ দিনে রোজাদারের জন্য দুটি কল্যাণ রয়েছে। একটি হচ্ছে সম্মানিত দিনে রোজা রাখার ফযিলত আর অন্যটি হচ্ছে, রোজা অবস্থায় দুয়া করার ফজিলত। এই দুআর একটি অংশ বা সম্পূর্ণটাই তিনি ইচ্ছা করলে হুসাইনের জন্য করতে পারেন।

আশুরার দিনে রোজা রাখার ফজিলতে যা বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلّٰهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেন: নবী (ﷺ) মদিনায় আগমন করে দেখলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কোন রোজা। তারা উত্তর দিল যে, এটি একটি বিরাট পবিত্র দিন। এদিনে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে

তাদের শত্রুদের কবল থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তাই মুসা (ﷺ) এ দিন রোজা রেখেছেন। নবী (ﷺ) তখন বললেন: তাদের চেয়ে মুসা (ﷺ)এর সাথে আমার সম্পর্ক অধিক। সুতরাং তিনি রোজা রাখলেন এবং সাহাবীদেরকে রোজা রাখার আদেশ দিয়েছেন।" (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ

"আয়েশা (ﷺ) বলেন: আইয়ামে জাহেলিয়াতেও কুরাইশরা আশুরার রোজা রাখত। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামও এ দিনে রোজা রাখতেন। মদিনায় হিজরত করে এসেও তিনি এ দিন রোজা রেখেছেন এবং লোকদেরকে রোজা রাখার আদেশ দিয়েছেন। যখন রমাযানের রোজা রাখা ফরজ করা হল তখন আশুরার রোজা ছেড়ে দিলেন। সুতরাং তখন থেকে যার ইচ্ছা রোজা রাখত আর যার ইচ্ছা রোজা রাখা ছেড়ে দিত।" (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল (ﷺ) যখন আশুরার রোজা রাখলেন এবং রোজা রাখার আদেশ দিলেন, তখন সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো এমন একটি দিন, যাকে ইয়াহুদ- নাসারারাও সম্মান করে। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন: আগামী বছর ইনশা- আল্লাহ্ নয় তারিখেও রোজা রাখবো। কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (বুখারী)

শিয়াদের বর্ণনায় আশুরার রোজা

আলী বিন আবু তালেব (ﷺ) বলেন:

صُومُوا الْعَاشُورَاءَ ، التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ ، فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ سَنَةً

তোমরা আশুরার অর্থাৎ নয় এবং দশ তারিখে রোজা রাখো। কেননা ইহা পূর্বের এক বছরের গুনাহকে মোচন করে দেয়। (দেখুনঃ ইস্তেবসার, ২/১৩৪, আলহুর রুল আমেলী ফী ওয়াসায়িলিশ শিয়া, ৭/৩৩৭)

জাফর (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আশুরার রোজা এক বছরের গুনাহর কাফফারা স্বরূপ।

আশুরার দিনে মাতম করার ভিত্তি কোথায়?

বর্তমানে আশুরার দিনে হুসাইনীয়াত নামে যে অনুষ্ঠান, মাতম, বুক ও গালে আঘাত করা, উচ্চস্বরে ক্রন্দন এবং বিলাপ করে থাকে তার কোন ভিত্তি নেই। আহলে বাইতের মাজহাবেও তার কোন দলীল নেই এবং সর্বোপরি ইসলামী আকীদার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। শিয়ারা যেহেতু বলে থাকে মুহাম্মাদ (ﷺ) যা হালাল করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা ছাড়া অন্য কিছু হালাল নয় এবং তিনি যা হারাম করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা ছাড়া অন্য কিছু হারাম নেই সেহেতু তাদের কাছে প্রশ্ন হল: আপনারা যদি উপরোক্ত কথাটি বিশ্বাস করেন তাহলে বাক্যটির বাস্তবায়ন কোথায়? রাসূল (ﷺ) কর্তৃক নিষিদ্ধ জাহেলী জামানার একটি অভ্যাসকে আপনারা ইসলাম ও আহলে বাইতের নিদর্শন নির্ধারণ করেছেন কেন?

আশ্চর্যের কথা হচ্ছে তাদের মাশায়েখগণ আশুরার দিনে মাতম ও হায় হুসাইন হায় হুসাইন বলে চিৎকার করাকে আল্লাহর নিদর্শন বলে উল্লেখ করে নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

﴿ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতি প্রসূত। (সূরা হজ্জ: ২২/৩২)

অতএব তারা বিলাপ করা, গাল ও বুক আহত করা, আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের সাহাবীদেরকে গালাগালি করাকে আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শন মনে করেই করে থাকেন। এর চেয়ে অধিক মূর্খতা আর কি হতে পারে?

আরও আশ্চর্যের কথা হচ্ছে আশুরার রোজার ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীছ থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে তারা জেনেও না জানার ভান করে থাকেন। অপর পক্ষে তাদের আলেমগণ এই বর্ণনাগুলোকে বারবার আহলে সুন্নত ও বনী উমাইয়াদের বানানো বলে অপবাদ দিয়ে থাকেন। তারা আরও বলেন যে, বনী উমাইয়াগণ হুসাইনের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠান করার জন্য এই রোজার প্রচলন করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ সুন্নি ও শিয়া উভয় মাজহাবের হাদীছের কিতাবেই এই রোজার ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ﷺ), তাঁর পবিত্র পরিবার এবং সাহাবীগণ আশুরার রোজা রেখেছেন। তিনি মুসলিমদেরকে রোজা রাখার আদেশ দিয়েছেন।

এখন তাদের কাছে প্রশ্ন হল: যে ব্যক্তি আশুরার দিনে রোজা রেখে, জিকির- আজকার করে, কুরআন তেলাওয়াত করে এবং অন্যান্য এবাদতের মাধ্যমে এই দিন অতিবাহিত করে সে হুসাইনের মৃত্যুতে আনন্দের অনুষ্ঠান করল? না যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে গোশত, খাদ্য- পানীয় এবং অন্যান্য বস্তু বিতরণ করল এবং বিভিন্ন শির্কী কবিতা আবৃতি করে রাত পার করে দিল সে হুসাইনের মৃত্যু উদযাপন করল? মূলত: তাদের কথার মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধীতা রয়েছে।

হুসাইনের হত্যায় ইয়াজিদ কতটুকু দায়ী?

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে আমার এই কথা ইয়াজিদের পক্ষে উকালতি করার জন্য নয়; বরং মূল সত্যকে বিশ্বের সকল বাংলাভাষী মুসলিমের সামনে তুলে ধরার জন্যে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেন: সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের ঐকমতে ইয়াজিদ বিনম মুয়াবিয়া হুসাইনকে হত্যার আদেন দেন

নি। বরং তিনি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে চিঠির মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ইরাকের জমিনে হুসাইনকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দেন। এতটুকুই ছিল তার ভূমিকা। বিশুদ্ধ মতে তার কাছে যখন হুসাইন নিহত হওয়ার খবর পৌঁছল তখন তিনি আফসোস করেছেন। ইয়াজিদের বাড়িতে কান্নার ছাপ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি হুসাইন পরিবারের কোন মহিলাকে বন্দী বা দাসীতে পরিণত করেন নি; বরং পরিবারের সকল সদস্যকে সম্মান করেছেন। সসম্মানে হুসাইন পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

যে সমস্ত রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, ইয়াজিদ আহলে বাইতের মহিলাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং তাদেরকে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে বেইজ্জতি করেছেন, তার কোন ভিত্তি নেই। বনী উমাইয়াগণ বনী হাশেমকে খুব সম্মান করতেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ বিন জাফরকে বিয়ে করলেন তখন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এই বিয়ে মেনে নেন নি। তিনি হাজ্জাজকে বিয়ে বিচ্ছিন্ন করার আদেশ দিয়েছেন।

শুধু তাই নয় হুসাইন হত্যার জন্য দায়ী উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের কাছে যখন হুসাইনের পরিবারের মহিলাদেরকে উপস্থিত করা হল তখন তিনি আলাদাভাবে তাদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের ভরণ- পোষণ ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

ঐতিহাসিক ইজ্জত দাররুযা বলেন: হুসাইন হত্যার জন্য ইয়াজিদকে সরাসরি দায়ী করার কোন দলীল নেই। তিনি তাঁকে হত্যার আদেশ দেন নি। তিনি যেই আদেশ দিয়েছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, তাঁকে ঘেরা করা হোক এবং তিনি যতক্ষণ যুদ্ধ না করবেন ততক্ষণ যেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করা হয়।

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন: এটি প্রায় নিশ্চিত যে ইয়াজিদ যদি হুসাইনকে জীবিত পেতেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করতেন না।

তার পিতা মুয়াবীয়া (ﷺ) তাকে এ মর্মে অসীয়তও করেছিলেন। ইয়াজিদ এই কথাটি সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিল।

তাহলে কে হুসাইনকে হত্যা করল?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কে হুসাইনকে হত্যা করল। সুন্নি মুসলিমগণ? আমীর মুআভীয়া? ইয়াজিদ বিন মুআভীয়া? না অন্য কেউ?

উত্তরটি মেনে নেওয়া অনেক মুসলিমের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হলেও তা প্রকাশ না করে পারছি না। প্রকৃত ও সঠিক তথ্য হল শিয়াদের একাধিক কিতাব বলছে যে, শিয়ারাই (ইরাক বাসীরাই) হুসাইনকে হত্যা করেছে। সায়্যেদ মুহসিন আল- আমীন বলেন: বিশ হাজার ইরাক বাসী হুসাইনের পক্ষে বায়আত নেয়। পরবর্তীতে তারা তাঁর সাথে খেয়ানত করেছে, তাঁর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে এবং তাঁকে হত্যা করেছে। (দেখুন: আয়ানুশ শিয়া ১/৩৪)

হুসাইনের হত্যাকারী নির্ধারণে ইবনে উমর (ﷺ)এর অভিমত

ইবনে আবী নু' ম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

كُنْتُ شَاهِدًا لاِبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ . قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا

আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন লোক তাঁকে মশা হত্যা করার হুকুম জানতে চাইল। তিনি তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কোন দেশের লোক? সে বলল: ইরাকের। ইবনে উমর (ﷺ) তখন উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর। সে আমাকে মশা হত্যা করার হুকুম জিজ্ঞেস করছে। অথচ

তারা নবী (ﷺ)-এর নাতিকে হত্যা করেছে। আর আমি নবী (ﷺ)কে বলতে শুনেছি, এরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুনিয়ার দু টি ফুল। (বুখারী, হাদীছ নং- ৫৯৯৪) অন্য বর্ণনায় মশার স্থলে মাছির কথা এসেছে।

হুসাইনের ভাষণই প্রমাণ করে যে ইয়াজিদ তাঁর হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী নয়

হুসাইন (ﷺ) নিহত হওয়ার পূর্বে ইরাকবাসীদেরকে ডেকে বলেছেন: তোমরা কি পত্রের মাধ্যমে আমাকে এখানে আসতে আহবান করো নি? আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করো নি? অকল্যাণ হোক তোমাদের! যেই অস্ত্র দিয়ে আমরা ও তোমরা মিলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এখন সেই অস্ত্র তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে চালাতে যাচ্ছ। মাছি যেমন উড়ে যায় তেমনি তোমরা আমার পক্ষে কৃত আয়আত থেকে সড়ে যাচ্ছ, পোঁকা-মাকড়ের ন্যায় তোমরা উড়ে যাচ্ছ এবং সকল ওয়াদা- অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। ধ্বংস হোক এই উম্মতের তাগুতের দলেরা! (দেখুন আল- ইহতেজাজ লিত তাবরুসী)

ইমাম হুসাইন তাঁর এই ভাষণের কোন স্থানেই ইয়াজিদকে দায়ী করেন নি। ঘুরেফিরে ভাষণটি এই কথার প্রমাণ করে যে, তাঁর করুন পরিস্থিতির জন্য ইরাকবাসীগণই দায়ী।

অতঃপর হুর বিন ইয়াজিদ নামক হুসাইনের একজন সমর্থক কারবালার প্রান্তরে দাড়িয়ে ইরাক বাসী সৈনিকদেরকে ডাক দিয়ে বললেন: তোমরা কি এই নেককার বান্দাকে এখানে আসতে আহবান করো নি? তিনি যখন তোমাদের কাছে এসেছেন তখন তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছ। আর তিনি এখন তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছেন। আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিন তোমাদের পিপাসা না মেটান এবং তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন!

(দেখুন আল- ইরশাদ লিলমুফীদ, পৃষ্ঠা নং- ২৩৪)

এই পর্যায়ে হুসাইন তাঁর পূর্বের সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটি বদদুআ করলেন। তিনি বলেন:

اللّٰهُمَّ إن مْتعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً أي شيعاً وأحزاباً واجعلهم طرائق قددا

ولا ترض الولاة عنهم أبدا ، فإنهم دعونا لينصرونا ، ثم عدوا علينا فقتلونا

"হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদের হায়াত দীর্ঘ করেন, তাহলে তাদের দলের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিন। তাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে ডেকে এনেছে। অতঃপর আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করছে এবং আমাদেরকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে। (দেখুন আল- ইরশাদ লিলমুফীদ, পৃষ্ঠা নং- ২৪১, ই- লামুল ওয়ারা লিত তাবরুসী, পৃষ্ঠা নং- ৯৪৯, কাশফুল গুম্মাহ, পৃষ্ঠা নং- ১৮- ৩৮)

হুসাইনের এই দুয়া প্রমাণ করে যে, ইয়াজিদ প্রত্যক্ষভাবে হুসাইনের হত্যায় জড়িত ছিল না। কেননা তিনি দুয়ায় বলেছেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইরাক বাসীগণ (শিয়ারা) উমাইয়া শাসকদের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় হুসাইনের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এবং তাঁর সাথে খেয়ানত করেছে। বাস্তবে তাই হয়েছে। পরবর্তীতে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকেও নির্মম ও নিকৃষ্টভাবে হত্যা করা হয়েছে।

আলী বিন হুসাইন তাঁর পিতা হুসাইনকে হত্যার জন্য কুফা বাসীদেরকে দায়ী করেছেন

শিয়া ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বলেন: আলী বিন হুসাইন যখন কুফায় প্রবেশ করলেন তখন দেখলেন কুফার মহিলারা হুসাইন হত্যার বেদনায় ক্রন্দন এবং বিলাপ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কি আমাদের হত্যায় বিলাপ করছে? তাহলে আমাদেরকে হত্যা করল কে? অর্থাৎ তারা ব্যতীত আমাদের পরিবারের লোক ও আত্মীয়দেরকে অন্য কেউ হত্যা করে নি (দেখুন: তারিখে ইয়াকুবে ১/২৩৫)

উপরে বর্ণিত পৃষ্ঠা নাম্বারসহ তাদের কিতাবগুলোর তথ্য প্রমাণ করে যে, যারা নিজেদেরকে হুসাইনের সমর্থক ও প্রেমিক বলে দাবী করেন, তারাই তাঁকে হত্যা করেছেন। অতঃপর এই মারাত্মক অপরাধের জ্বালা অন্তর থেকে দূর করার জন্য তারাই পরবর্তীতে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন এবং যাদের কান্না আসে নি, তারাও অযথা কান্নার ভান করেছেন। এই খেলা- তামাশা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং এখনও চলছে। তাদের অনুসারীরা এখনও হুসাইনের জানাযা বহন করছেন।

হুসাইনের মৃত্যুতে রোদন করা যদি আহলে বাইতের প্রতি তাদের প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণ হয়, তাহলে তারা হামজাহ (রাঃ)এর মৃত্যুতে রোদন করে না কেন?

হুসাইনের উপর তাদের এই কান্না যদি আহলে বাইতের প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণেই হত, তাহলে শহীদদের সরদার রাসূলের চাচা হামজা (রাঃ)এর মৃত্যুতেও তারা ক্রন্দন করত। তাঁকে যে নির্মমভাবে ও পাশবিকতার হত্যা করা হয়েছে, হুসাইন হত্যার পাশবিকতার চেয়ে তা কোন অংশে কম নয়। সায়্যেদ হামজাকে হত্যা করে তাঁর পেট ফেরে কলিজা বের করা হয়েছে। তারা কেন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বাৎসরিক মাতম করে না? তাদের বুক ও চেহারায় আঘাত করে না কেন? কাপড় টেনে ছিঁড়ে না কেন? প্রতি বছর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন ও তারিখ আসে তখন তলোয়ার খেলায় মেতে উঠে না কেন? সায়্যেদ হামজাহ (রাঃ) কি আহলে বাইতের একজন সম্মানিত সদস্য নন? এখানেই শেষ নয়; রাসূলের মৃত্যুর চেয়ে অধিক বড় কোন মুসীবত আছে কি? তাঁর মৃত্যুতে তাদের ক্রন্দন ও মাতম কোথায়? সচেতন পাঠকদেরকেই এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে নিতে হবে এবং কারও আকীদায় ত্রুটি থাকলে লেখাটি পড়েই তা সংশোধন করে নিতে হবে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, তাদের কাছে হুসাইনই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কি কারণে তাদের কাছে এত প্রিয়? উত্তর পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেটিই আসল কারণ? না ইমাম হুসাইন কর্তৃক একজন পারস্য মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, তাই এত ভালবাসা? উভয়টিই এর কারণ হতে মানা কোথায়? হুসাইন ও তাঁর পিতা আলী বিন আবু তালিব সম্পর্কে তাদের অন্যান্য আকীদাহ- বিশ্বাসের দিকে না গিয়ে এখানেই ছেড়ে দিলাম।

হুসাইন এর মাথা কোথায় গিয়েছিল?

দামেস্কে ইয়াজিদের দরবারে হুসাইনের মাথা প্রেরণের বর্ণনা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয় নি। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, তিনি কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। তাঁর সম্মানিত মাথা কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আনাস বিন মালিক বলেন: হুসাইনের মাথা উবাইদুল্লাহএর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁর মাথাকে একটি থালার মধ্যে রেখে একটি কাঠি হাতে নিয়ে তা নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখে সম্ভবত বেখেয়ালে কিছুটা বর্ণনাও করে ফেলেছিলেন। হাদীছের শেষের দিকে আনাস বলেন: হুসাইন ছিলেন রাসূল ()-এর সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। (বুখারী)

অন্য বর্ণনায় আছে, আনাস বলেন: আমি উবাইদুল্লাহকে বললাম, তোমার হাতের কাঠি হুসাইনের মাথা থেকে উঠিয়ে ফেল। কারণ আমি তোমার কাঠি রাখার স্থানে রাসূলের পবিত্র মুখ দিয়ে চুমু খেতে দেখেছি। এতে কাঠি সংকোচিত হয়ে গেল।

(দেখুন: ফতহুল বারী ৭/৯৬)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরপর কোথায় হুসাইনের কবর হয়েছে এবং তাঁর মাথা কোথায় গিয়েছে, তা সঠিক সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় নি। প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞান আল্লাহর নিকটেই।

যেমন কর্ম তেমন ফল

পরবর্তীতে আল- আশতার নাখয়ীর হাতে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ নির্মমভাবে নিহত হন। যখন নিহত হলেন তখন তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মসজিদে রাখা হল। তখন দেখা গেল একটি সাপ এসে মাথার চারপাশে ঘুরছে। পরিশেষে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হল। পুনরায় মুখ দিয়ে প্রবেশ করে নাকের ছিদ্র দিয়ে তিনবার বের হতে দেখা গেল।

(দেখুন: তিরমিযী, ইয়াকুব বিন সুফীয়ান)

ইয়াজিদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের ধারণা কেমন হওয়া উচিত

তাফসীর, হাদীছ, আকীদাহ, এবং ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় সালফে সালেহীনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় কোন ইমামের কিতাবে ইয়াজিদের উপর লানত করা বৈধ হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি। কেউ তার নামের শেষে রাহিমাহুল্লাহ বা লাআনাহুল্লাহ- এ দু্টি বাক্যের কোনটিই উল্লেখ করেন নি। সুতরাং তিনি যেহেতু তার আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের জবান দরাজ করা ঠিক নয়। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার আমল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমাদের আমলের হিসাব আমাদেরকেই দিতে হবে। তার ভাল মন্দ আমলের হিসাব তিনিই দিবেন।

ইমাম যাহাবী ইয়াজিদের ব্যাপারে বলেন: لانسبه ولانحبه

অর্থাৎ "আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালও বাসবো না।" মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরও যে সমস্ত পাপ কাজের অপবাদ ইয়াজিদের প্রতি দেয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর চেয়ে হুসাইন যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং তিনি মুসলিম ছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা যেহেতু উপস্থিত ছিলাম না, তাই তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ। তা ছাড়া বুখারী শরীফের একটি হাদীছে তার ক্ষমা পাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, রাসূল () বলেন: আমার উম্মতের একটি দল কুস্তুনতীনিয়ায় যুদ্ধ করবে। তাদেরকে ক্ষমা করা দেয়া হবে। জানা যাচ্ছে, ইয়াজিদ বিন মুআভীয়া ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি। আর হুসাইন তাতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে শরীক ছিলেন। সুতরাং ইয়াজিদও ক্ষমায় শামিল হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

হুসাইন (রাঃ)- এর শাহাদাতের ঘটনায় বাংলাভাষী সুন্নী মুসলিমদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণসমূহঃ

১) বিষাদসিন্ধু কাল্পনিক ও মিথ্যা কাহিনীঃ

বাংলাভাষী মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ মীর মোশাররফ হুসাইন কর্তৃক রচিত বিষাদ সিন্ধু উপন্যাসটি পড়ে থাকেন। কারবালায় ইমাম হুসাইন (রাঃ) নিহত হওয়ার ঘটনাকে বিষয় বস্তু করে এই উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। এতে ইমাম হুসাইনের ফজীলতে অসংখ্য বানোয়াট কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। অপর পক্ষে ইয়াযীদকে এমন এমন অপরাধে অভিযোক্ত অভিযুক্ত করা হয়েছে, যার সঠিক কোন দলীল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বইটি বাংলাভাষী মুসলিমগণ বিশেষ গুরুত্বের সাথে পাঠ করে থাকেন। পরিতাপের বিষয় হল আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোর সিলেবাসের বাংলা সাহিত্য বইয়েও প্রবন্ধ আকারে বিষাদ সিন্ধু থেকে নির্বাচন করে বেশ কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সব পড়ে ও শুনে মুসলিম ছাত্রগণ কারবালার ঘটনা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে গড়ে উঠছে। দাখিল শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাদের বাংলা সাহিত্য বইয়ে হায়রে অর্থ নামে একটি প্রবন্ধ ছিল। এই প্রবন্ধে ইয়াযীদকে যে সমস্ত দোষে দোষারোপ করা হয়েছে, তা পাঠ করে বিভ্রান্তি বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। কারণ এগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েগুছিয়ে সাহিত্যিক মান দিয়ে লেখা হয়েছে, তা খুবই আকর্ষণীয়।

সুতরাং কারবালার ব্যাপারে সুন্নী মুসলিমদের ভিতরে ভুল ধারণা প্রবেশের অন্যতম একটি কারণ।

২) সরকারী কর্মসূচী ও তৎপরতাঃ

মুহাররাম ও আশুরা উপলক্ষে আমাদের দেশের সকল সরকারই তার নিয়ন্ত্রিত রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে-বিশেষ কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এই দিন সরকারী ছুটি

থাকে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতা- নের্তৃদের বাণীও প্রচার করা হয় এই মাধ্যমগুলো। ইয়াজীদের প্রতি দোষারূপ ও ইমাম হুসাইনের প্রশংসাই থাকে এগুলোর মূল বিষয়। এ কথা ঠিক যে, যারা হুসাইন (রাঃ)কে হত্যা করেছে তারা স্বৈরাচারী, জালেম ও পৈশাচিক নরপশুর পশুর চেয়েও অধম ছিল। তাই বলে যুগ যুগ ধরে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। আরও উল্লেখ করা হয় যে, কারবালায় মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে স্বৈরাচারী ও পৈশাচিক নরপশুর হাতে রাসূলের পবিত্র দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের শাহাদতকে কেন্দ্র করেই এদিনটি মুসলিম উম্মার নিকট একটি পবিত্র দিন হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সুতরাং তাদের ভাষায় এটি একটি ধর্মীয় পবিত্র দিন। তারা এ কথাটি একবারের জন্যও উচ্চারণ করে না যে, আশুরার দিনটি ইসলামের বহু যুগ আগে থেকেই ফজীলতপূর্ণ ও পবিত্র। আল্লাহর নবী মুসা (আঃ)এই প্রথম এই দিনে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ রোজা রেখেছেন। পরবর্তীতে আমাদের নবী (সাঃ)ও এর উপর জোর দিয়েছেন। তা ছাড়া মুহাররামের ১০ তারিখে আল্লাহ তাআলা আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়েছেন, সে সম্পর্কে এরা কোন ইঙ্গিতই করে না।

তারা এটি জানে না যে, ইমাম হুসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন, ৬১ হিজরীর মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে আর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন ১১ হিজরী সালে। রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর সাথে সাথে অহী আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই অহীর দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ৫০ বছর পর যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। যে দিন সেই ঘটনা ঘটেছে সেই দিনও পবিত্র হতে পারে না। কুরআন ও সহীহ্ হাদীছ যে সমস্ত স্থান ও সময়কে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে, তা ব্যতীত কোন দিন ও সময় পবিত্র হতে পারে না। মোটকথা সরকারীভাবে দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালন করার

কারণে কারবালার ঘটনা ও ইমাম হুসাইনের শাহাদতের বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশের মুসলিমগণ বিভ্রান্তিতে পড়েছেন।

৩) শিয়াদের প্রচারণাঃ

আমাদের দেশে শিয়াদের সংখ্যা একেবারে কম হলেও ইসলামের লেবাস পড়ে তারা আশুরার দিন তাজিয়া মিছিল, মার্সিয়া এবং আরও অনেক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তারা প্রতি বছর এই দিনে ঢাকা শহরে প্রকাশ্যেই হুসাইনের প্রতীকি লাশ বহন করে শোক মিছিল করে, শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে। শরীরে রক্তের মত লাল রং লাগিয়ে হায় হুসাইন হায় হুসাইন করে চিৎকার করে এবং বুক ও ঘালে চপেটাঘাত করে। হুসাইনের প্রতি তাদের এই আবেগ ও কল্পিত ভালবাসা দেখে সরল মনা ও নবী পরিবারের প্রেমিক সুন্নী মুসলিমগণ প্রভাবিত হয়ে তাদের বর্ণনা বিশ্বাস করে থাকেন। যার কারণে আমাদের দেশের সুন্নী মুসলিমগণ শিয়াদের প্রতিবাদে কোন কথা শুনতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নন। আসলে এটি যে, মাছের মায়ের পুত্র শোকের মত তা বুঝার মত পর্যাপ্ত দ্বীনি জ্ঞান ও সঠিক ইতিহাস তাদের জানা নেই।

৪) দাপটের সাথে পত্র- পত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়ার প্রচারঃ

আমাদের দেশের সকল জাতীয় পত্রিকা, আঞ্চলিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন এবং সকল প্রকার বেসরকারী ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া কারবালার ঘটনাটি অন্যের অন্ধ অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। প্রতি বছর মুহাররাম মাস আসার সাথে সাথেই প্রতিদিন পত্রিকাগুলোতে এ উপলক্ষ্যে বিশেষ কলাম দেয়া হয়। এগুলো পড়ে সুন্নী মুসলিমগণ আবেগে আপ্লুত হয়ে পত্রিকাগুলোতে যা লেখা হয় তাই বিশ্বাস করেন। অপর পক্ষে মূল সত্যটি কেউ প্রকাশ করেন না। অনেকের জানা থাকলেও শ্রোতের বিপরীতে নৌকা চালাতে তারা সাহসিকতা প্রদর্শন করতে চান না। এ কারণেও সুন্নী মুসলিমগণ যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

৫) পীরদের ভূমিকাঃ

আমাদের দেশের মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ পীর-মুরীদিবাদে বিশ্বাসী। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এ সকল পীরদের তরীকা ও সিলসিলা কোন এক পর্যায়ে শিয়া ইমামদের কারও না কারও সাথে মিলে যায়। সুতরাং পীরেরা এক দিকে যেমন ইসলামের নাম ভাঙ্গি মুরীদ বানিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছেন অপর পক্ষে তারা সুন্নী লেবাস পড়ে অনেক ক্ষেত্রে শিয়া মাজহাবের আকীদাই প্রচার করে যাচ্ছেন। সুতরাং তাদের দ্বারা মুহাররাম, কারবালা ও ইমাম হুসাইনের শাহাদাত নিয়ে সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তার প্রতিবাদের আশা করা আদৌ সম্ভব নয়।

৬) হাসান ও হুসাইনের ফজীলতে বর্ণিত হাদীছসমূহ পড়ে অতি আবেগী হওয়াঃ

আহলে বাইত এবং রাসূল (ﷺ)-এর সকল সাহাবীকে ভালবাসা আহলে সুন্নাত ও ওয়াল জামআতের আকীদার অন্যতম অংশ। হাসান ও হুসাইন যেহেতু রাসূল (ﷺ)-এর সম্মানিত কন্যা ফাতেমার সন্তান এবং তাদের ফজীলতে বেশ কিছু হাদীছ সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত তাদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস। তাই আমরা হাসান ও হুসাইনকে ভালবাসি। তাদের ফজীলতে যে সমস্ত সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেঃ

ক) বারা বিন আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

رأيت النبي صلى الله عليه و سلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللَّهُمَّ إني أحبه فأحب وأحب من يحبه

আমি রাসূল (ﷺ)- কে দেখেছি, তিনি হাসান বিন আলীকে কাঁধে নিয়ে বলেছেনঃ হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি। সুতরাং তুমিও তাঁকে ভালবাসো এবং যে তাঁকে ভালবাসে তুমি তাকেও ভালবাসো। (বুখারী)

খ) রাসূল (ﷺ) বলেন: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

হাসান ও হুসাইন জান্নাতবাসী যুবকদের সরদার হবেন। (তিরমিজী, ইমাম আলবানী সহী বলেছেন।

(দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ৭৯৬)

গ) আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) বলেন: হুসাইনের মাথা উবাইদুল্লাহএর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁর মাথাকে একটি থালার মধ্যে রেখে একটি কাঠি হাতে নিয়ে তা নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখে সম্ভবত বেখেয়ালে কিছুটা বর্ণনাও করে ফেলেছিলেন। হাদীছের শেষের দিকে আনাস (رضي الله عنه) বলেন: হুসাইন (رضي الله عنه) ছিলেন রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। (বুখারী)

ঘ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ)কে বলতে শুনেছি, এরা দু'জন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুনিয়ার দু'টি ফুল। (বুখারী, হাদীছ নং- ৫৯৯৪)

তাদের ফজীলতে এমনি আরও অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ﷺ) তাদের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করেছেন।

ইসলাম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী একজন মুসলিম এ সমস্ত হাদীছ পড়ে বা শুনে এবং সেই সাথে কারবালা নিয়ে অনেক লেখকের কাল্পনিক ও মিথ্যা কাহিনী পড়ে আবেগময়ী হয়ে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাই বলে তাঁর আদরের নাতি ও ফাতেমা (رضي الله عنها)- এর পুত্র হওয়ার কারণে অতি আবেগী হয়ে তাদের প্রতি ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করা এবং মুয়াবীয়া (رضي الله عنه) বা অন্য কোন সাহাবীর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করা বা গালি দেয়া যাবে না।

মুসলিমগণকে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, রাসূলের অন্যান্য সাহাবীদের ফজীলতেও অসংখ্য সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনেও তাদের ফজীলতে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। সুতরাং সকল সাহবীকেই ভালবাসতে হবে। সুতরাং কারও ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করা চলবে না।

ইয়াযীদের ব্যাপারেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ যে মূলনীতি বেঁধে দিয়েছেন, তার বাইরে যাওয়া যাবে না। তাদের কথা হচ্ছে, তার উপর লানত বর্ষন করা এবং তাকে গালি দেয়া যাবে না। এমনিভাবে হাসান ও হুসাইন এবং আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসায় কোন প্রকার বাড়াবাড়ি। যেমনটি করে থাকে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। কারণ আল্লাহ্ তাআলা এবং রাসূল (ﷺ) দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত ছয়টি কারণ ছাড়াও আরও অনেক কারণে আমাদের বাংলাদেশী সুন্নী মুসলিমদের মাঝে কারবালার ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করি। দ্বীনের সঠিক শিক্ষার বিস্তার হলে এবং ইসলামের ইতিহাসের সঠিক তথ্য তুলে ধরে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হলে অচিরেই সুন্নী মুসলিমগণের ভুল ধারণা পাল্টে যাবে ইনশা- আল্লাহ। যোগ্য আলেম ও দাঈদের এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখা উচিত।

উপসংহার

হুসাইনের মৃত্যু নিয়ে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত। একদলের মতে তিনি অন্যায়ভাবে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য ইয়াজিদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাই তাঁকে হত্যা করা সঠিক ছিল। তারা বুখারী শরীফের এই হাদীছ দিয়ে দলীল দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। রাসূল (ﷺ) বলেন:

مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

"একজন শাসকের সাথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি তোমাদের জামআতে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য কেউ আগমন করলে তাকে হত্যা করো।" (বুখারী)

তারা বলেন: মুসলিমরা ইয়াজিদের শাসনের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। হুসাইন এসে সেই ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁকে হত্যা করা যুক্তিসংগত হয়েছে।

অন্যদল মনে করেন হুসাইনই ছিলেন খেলাফতের একমাত্র হকদার। তাঁর আনুগত্য করা ব্যতীত অন্য কারও অনুসরণ করা বৈধ ছিল না। জামাআত, জুমআসহ ইসলামের কোন কাজই তাঁর পিছনে বা তাঁর নিয়োগ কৃত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারও অনুসরণ করে সম্পাদন করলে তা বাতিল হবে। এমন কি তাঁর অনুমতি ব্যতীত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও বৈধ ছিল না। এমনি আরও অনেক কথা। এই দলের কথার সমর্থনে কোন সুস্পষ্ট দলীল খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আর উপরোক্ত উভয় দলের মাঝখানে হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামআতের মাজহাব। তাঁরা উপরের দুটি মতের কোনটিকেই সমর্থন করেন না। বরং তাঁরা বলেন: হুসাইন মজলুম ও শহীদ অবস্থায় নিহত হয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতির নির্বাচিত আমীর বা খলীফা ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয় মতের পোষণকারীদের কথা ঠিক নয়।

আর যারা বুখারী শরীফের হাদিছকে দলীল হিসেবে পেশ করে হুসাইনকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার কথা বলে থাকেন তাদের দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। হাদীছ কোনভাবেই তাদের কথাকে সমর্থন করে না। কারণ তিনি যখন তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলের চিঠি পেলেন তখন খেলাফতের দাবী ছেড়ে দিয়ে ইয়াজিদের সৈনিকদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেছেন।

সিরিয়ায় গিয়ে তাঁকে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাত করতে দেয়া হোক।

অথবা তাকে মুসলিম রাজ্যের কোন সীমান্তের দিকে যেতে দেয়া হোক।

অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেয়া হোক।

কিন্তু তারা কোন প্রস্তাবই মেনে নেয় নি। বরং তারা তাঁকে আত্ম সমর্পণ করে তাদের হাতে বন্দী হওয়ার প্রস্তাব করল। অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাদের পাল্টা প্রস্তাব মেনে নেওয়া হোসাইনের উপর মোটেই

ওয়াজিব ছিল না। সুতরাং তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করাকেই বেছে নিলেন এবং ইয়াজিদের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে শাহাদাত বরণ করলেন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, হুসাইনের মৃত্যু ও কারবালার ঘটনা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। এই হত্যা কাণ্ডের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অন্যান্য মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড থেকে আলাদা কোন ঘটনা নয়। এ জাতিয় সকল ঘটনাকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। বিষাদসিন্ধু মুসলিমদের কোন মূলনীতির গ্রন্থ নয়। এটি একটি কাল্পনিক উপন্যাস মাত্র। তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম জাতি ঐতিহাসিকভাবে একটি প্রমাণিত সত্যকে বাদ দিয়ে কাল্পনিক কাহিনীকে কখনই সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সংযুক্তি

আয়েশা কি উটের পিঠে বসে যুদ্ধ করেছেন? না অন্য কিছু?

উছমান বিন আফফান শহীদ হওয়ার পর উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উছমান এর হত্যাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝিই এই যুদ্ধের মূল কারণ। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলেন আলী এবং অপর পক্ষে ছিলেন আয়েশা, তালহা এবং যুবায়ের। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এই পোস্টের উদ্দেশ্য নয়। এখানে যে কথাটি আমি বলতে চাই তা হলো কোন পক্ষেরই যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিলনা।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেনঃ আয়েশা যুদ্ধের জন্য বের হন নি। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্যে বের হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর বের হওয়ার মধ্যেই মুসলিম উম্মাতের জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, বের না হওয়াটাই ছিল ভাল। তাই তিনি যখনই বের হওয়ার কথা স্মরণ করতেন তখন কেঁদে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন। এমনিভাবে যারাই আলী এবং মুআবিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সবাই পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়েছেন।

আয়েশা এর বের হওয়া সম্পর্কে নবী (ﷺ) ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আয়েশা বনী আমেরের বাড়ি- ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁকে দেখে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল। তিনি বললেনঃ এই জলাশয়টির (পুকুরটির) নাম কি? লোকেরা বললোঃ এটির নাম 'হাও- আব। এ কথা শুনে আয়েশা বললেনঃ আমার ফেরত যেতে ইচ্ছে করছে। যুবায়ের তাঁকে বললেনঃ অগ্রসর হোন! যাতে মানুষেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং হতে পারে আল্লাহ

তা আলা আপনার মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। তিনি পুনরায় বললেনঃ মনে হচ্ছে আমার ফেরত যাওয়া উচিত। কেননা আমি রাসূল (ﷺ)কে বলতে শুনেছি, তিনি আমাদেরকে (নবী পত্নীদেরকে) লক্ষ্য করে বলেছেনঃ 'কেমন হবে তখনকার অবস্থা যখন তোমাদের কাউকে দেখে হাও- আবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে?। (দেখুনঃ মুস্তাদরাকুল হাকীম। ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) বলেনঃ হাদীছের সনদটি বুখারীর শর্ত অনুযায়ী, ফাতহুল বারী, (১২/৫৫)

হাদীছের সরল ব্যাখ্যা এই যে, নবী (ﷺ) আয়েশা কে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ 'হে আয়েশা! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে? যেদিন তোমাকে দেখে 'হাও- আব নামক জলাশয়ের নিকটস্থ কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। আয়েশা নবী (ﷺ)এর বাণীটি মুখস্থ করে রেখেছিলেন। তিনি যখন ইরাকের বসরা শহরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলেন তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে নবী (ﷺ)এর ভবিষ্যৎ বাণীটি স্মরণ করে জিজ্ঞেস করলেন এটি কোন জলাশয়? লোকেরা বললঃ এটি হাও- আবের জলাশয়। এই কথা শুনে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হলেন যে তিনি ফিতনায় পড়ে গেছেন এবং বার বার ফেরত আসার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে তিনি নিরাপদে মদীনায় ফেরত আসলেন। তিনি নিজে যুদ্ধ করেন নি এবং কাউকে যুদ্ধের আদেশও দেন নি। যুদ্ধের নের্তৃত্ব দেয়ার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং তিনি যুদ্ধের জন্য বের হয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের নের্তৃত্ব দিয়েছেন এ জাতীয় কথা সঠিক নয়। ইসলামের শত্রুরা যখন দেখল অস্ত্রের মাধ্যমে মুসলিমদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়, তখন তারা ইসলামকে বিকৃতি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ইসলামের সঠিক ইতিহাস বিকৃত করতে তৎপর হয়েছে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষার নামে বিভিন্ন বিভাগ খুলে তারা ইসলাম চর্চা শুরু করে। মুসলমানদের মেধাবী ছাত্রদেরকেও তারা বৃত্তি ও বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে তাদের দেশে নিয়ে উচ্চ ডিগ্রী প্রদান করে। এই ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ইসলামকে মানার জন্য

তাদের ইসলাম চর্চা নয়; বরং ইসলামের ভিতরে দোষ খুঁজার জন্যই ইসলাম নিয়ে তাদের গবেষণা শুরু হয়। মুসলিমদেরকে তাদের সঠিক ইতিহাস থেকে ফিরিয়ে রেখে ভুল ইতিহাস শিক্ষা দিয়ে বিভ্রান্ত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামের যে ইতিহাস পড়ানো হয়, তা ইসলামের মূল উৎস থেকে নেওয়া হয় নি। তা তৈরী করেছে বৃটিশ শাসন আমলের প্রাচ্যবিদগণ। প্রাচ্যবিদ কথাটির আরবী শব্দ হচ্ছে المستشرق। অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্বের লোকগণ প্রথমে ইসলাম নিয়ে গবেষণা শুর করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের সামনে ইসলামকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা। ইসলামকে ভালবেসে তারা ইসলামের চর্চা করে নি। এই প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আঘাত করেছে। যুগে যুগে তারা ইসলামকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে। উষ্ট্রের যুদ্ধে আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের নের্তৃত্ব দিয়েছেন এটিও তাদের তৈরী একটি বিকৃত তথ্য।

সুতরাং আমাদের ইতিহাসের মধ্যে যেহেতু সুকৌশলে ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই আমাদের পাঠ্য বইয়ের ইসলামী ইতিহাসগুলো সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করতে হবে এবং আরবী ভাষায় যোগ্যতা অর্জন করে ইসলামের মূল কিতাবগুলো থেকে সরাসরি ইতিহাস চর্চা করতে হবে।

এ কাজে আমরা যত দ্রুত অগ্রসর হতে পারব, ততই আমাদের কল্যাণ হবে এবং আমরা অনেক ভুল তথ্য থেকে বাঁচতে পারবো। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানার এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার তাওফীক দিন। আমীন!

–সমাপ্ত–